নির্ভয়পুরের ছবি

অসিত কুণ্ডু

গ্রীষ্মের দুপুর। কাঠফাটা রোদ সঙ্গে তীব্র গরম। বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় লু বইছে। এখন তো নিয়মটাপ না হলে বৃষ্টির দেখা মেলা ভার। দিন দিন উষ্ণতা যেন বেড়েই চলেছে। প্রিয়নাথ দু'হাতে দুটো ভারী ট্রাউস ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া ব্রিজের মুখে উঠল। স্ট্যান্ড রোডে বেশ কয়েকটা বাসে উঠতে গিয়েও পারেনি। কন্ডাক্টরের সদিচ্ছা থাকলেও ভেতরে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তারওপর অন্তরায় দু'হাতে দুটো বড় ভারী ব্যাগ। বিকল্প ব্যবস্থা বড়ই ব্যয়বহুল - অগত্যা হন্টন। ছাতা থাকলেও দু'হাতে দুটো ব্যাগ থাকায় প্রস্ফুটিত না হয়ে সাইড ব্যাগে আশ্রয় নিয়েছে। রোদের তেজে মাথা যেন বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। ঘাম না হলেও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। দুটো-দশের আরামবাগ লোকালটা ধরতেই হবে। ক্লান্ত পা দুটো বেশ জোরেই চালাতে লাগল প্রিয়নাথ। কিছুটা এগিয়ে আর পারল না। শরীরের আর দোষ কী, বয়স তো নয় নয় করে হাফ সেঞ্চুরি। হেঁটে ব্রিজ পার হওয়াটা মনে হচ্ছে হঠকারী সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। ফুটপাতে ছায়া দেখে ব্যাগ দুটো রেখে রুমাল বের করে মুখটা মুছল। লু বইলেও গরম বাতাস গঙ্গার জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঈষৎ শীতল। ক্লান্তি কিছুটা কমলেও পা-দুটো যেন ভারী থাম। না, দুটো-দশের লোকালটা মনে হচ্ছে মিস্ হবে। পরের ট্রেনটা ধরতেই হবে। আরামবাগ স্টেশনে নেমে, সাইকেল নিয়ে সোজা নির্ভয়পুর।

এখন ব্রিজের ওপর পথচারী কিছুটা কম। স্রোত নয়, ধীর গতিতে পারাপার করছে মানুষ। পাশেই এক তান্ত্রিক সাধুবাবা লোক ঠকানোর পসরা সাজিয়ে বসে আছে খদ্দেরের আশায়। প্রিয়নাথ ভাবে এই একবিংশ শতাব্দীতেও এই ভাবে রোজগার হয়। বিজ্ঞান এগোলেও বিজ্ঞান মনস্কতা যেন থমকে গেছে। ব্যাগ দুটো আবার হাতে নিয়ে তুলতে যেতেই ডাকটা শুনতে পেল। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ব্যাগ দুটো না তুলে এদিক ওদিক তাকাল। ভাবল একই নামে অন্য কাউকে হয়তো ডাকছে। এই ব্রিজের ওপর তার চেনা মানুষ কে থাকবে, চোখেও তো পড়ছে না।

– এই প্রিয়, প্রিয়নাথ।

আবার এদিক ওদিক তাকালো। চলমান মানুষের মাঝে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ডাকটা কোনদিক থেকে আসছে।

– এই শুনতে পাচ্ছিস না, এদিকে আয়।

এবার অনুমান করল ডাকটা ওই সাধুবাবার কাছ থেকেই আসছে। সরাসরি তাকাল। একরাশ দাড়ি, গোঁফ, গেরুয়া লুঙ্গি, মাথায় জটাধারী চুল, পাশে একটা গেরুয়া ঝোলা। সামনে চাদরের ওপর ছরিয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন উপকরণ। প্রিয়নাথের তাকানো দেখে সাধুবাবা বুঝল - না ভুল হয়নি। এত বছর পর হলেও তার চিনতে ভুল হয়নি। নিশ্চিত হয়ে বলল – আয়, এদিকে আয়।

প্রিয়নাথের মনে একরাশ কৌতূহল। সাধুবাবা তাকে খদ্দের বানিয়ে কিছু গছাবার চেষ্টা করছে না তো? এটা ব্যবসার কৌশলও হতে পারে। কিন্তু তার নামটা জানল কী করে! কণ্ঠস্বরটাও কেমন চেনা চেনা লাগছে। আরও কাছে গিয়ে ব্যাগ দুটো পাশে রেখে দাঁড়াল। একজোড়া চোখ আর হাসি সমস্যার সমাধান করে দিল।

– আসে সত্য না?

– যাক, চিনেছিস তাহলে। বাঁচা গেল।

চারপাশ দেখে নিয়ে নিচু স্বরে বলল - এখন আর সত্যপ্রিয় নয়, স্বামী সত্যানন্দ। এই বেশভূষা আমাকে আনন্দে রেখেছে। প্রিয়নাথের যেন বিস্ময় কাটছে না। কতদিন পর দেখা- তা প্রায় কুড়ি বছর। মেলাবার চেষ্টা করছে কুড়ি বছর আগের সত্যপ্রিয়র সঙ্গে। এতদিন পর দেখা তবুও উচ্ছ্বাসের স্বাভাবিকতা থাকছে না। কোথায় যেন তাল কেটে দিচ্ছে সত্যপ্রিয়র বেশভূষা। শুধু ঘিরে থাকছে একরাশ কৌতূহল।

একই গ্রাম, একই স্কুল। উচ্চমাধ্যমিকে সত্যপ্রিয়র বিপর্যয় ঘটল। তারপরের বছরেও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারল না। না পারলেও সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যও হয়ে গেল। বেশ তো চলছিল - তারপর কী যে ঘটল।

সত্যপ্রিয় চাদরের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অর্থ উপার্জনকারী বস্তুগুলো ঝোলায় পুরতে লাগল। বিভিন্ন গাছের শিকড়-বাকড়, মাদুলি, নানা রঙের ছোটো বড়ো পাথর। গোছাতে গোছাতেই বলল – তুই এখন কী করছিস?

– ব্যাগ দুটো দেখে বুঝতে পারছিস না। গ্রামে মুদির দোকান দিয়েছি। শহরে শপিং মল গজিয়ে ওঠায় অস্তিত্বের লড়াই। তাই চেষ্টা করি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। একা তো - বেশ কষ্ট হয়। লোক রাখতেও সাহসে কুলোয় না। হাড়ভাঙা পরিশ্রম।

– সে কী রে! তুই তো পড়াশোনায় ভালো ছিলিস। তোর কেন এই দশা? আমায় দেখ কেমন বিন্দাস আছি।

প্রিয়নাথ এ কথার কোন উত্তর দিল না। ভাবল সত্যপ্রিয়র কোন উন্নতিই হয় নি। সাধু হলেও জীবনবোধটাই অজানা।

– আমার কথা থাক। শুনেছিলুম তুই তো মিশনে-টিশনে পালিয়ে গিয়েছিলি, সাধু হবার বাসনা নিয়ে। তোর বাড়ির লোকেরাও তো সেটাই জানে। শেষে লোক ঠকানোর ব্যবসা খুলে বসেছিস।

– চুপ, চুপ, সে সব কথা পরে হবে।

– পরে আর কখন হবে। তাড়াতাড়ি তোর ফোন নম্বরটা দে। ট্রেনের তাড়া আছে, পরে কথা হবে।

– দাঁড়া, দাঁড়া এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? এত বছর পর দেখা। এখন ছাড়ছে কে তোকে। এখন তো আরামবাগের অনেক ট্রেন।

– তুই কী করে জানলি? তুই তো বহুদিন বাড়ি ছাড়া।

সত্যপ্রিয় একটু আনমনা হল। মনে মনে বলল, না গেলে কী খবর রাখতে নেই।

– চল, পাশেই আমার আস্তানা।

– নারে, আজ হবে না।

– কেন, তাড়া কিসের? বাড়িতে কেউ অপেক্ষা করছে? দাঁড়া দাঁড়া কী যেন নাম? মনে করার চেষ্টা করল। কুসুম - তোর কাছে পড়তে আসতো।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল – নারে, সন্ধেবেলায় কিছু তাগাদা আছে। বুঝতেই তো পারছিস, কম পুঁজির ব্যবসায় ঝক্কি অনেক।

কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে সত্যপ্রিয় ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে দূরে বিবেকানন্দ সেতুর ফাঁক দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে 'জয় মা ভবতারিণী' বলে, মৃদুস্বরে বলল - আমাকে অনুসরণ কর।

স্বামী সত্যানন্দের আদেশে কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বে, কিছুটা কৌতূহলে আবার ভারী ব্যাগ দুটো দু'হাতে তুলে নিল প্রিয়নাথ। সত্যপ্রিয়র কাঁধে ঝোলা আর বাঁহাতে একটা মসৃণ কালচে লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই। প্রিয়নাথ আশা করেছিল বন্ধু একটা ব্যাগ সেয়ার করবে। পরিচিত কেউ দেখে ফেললে প্রফেসনের ক্ষতি হবে, সেজন্যই এড়িয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর ব্রাবোর্ন রোডের পাশে বনফিল্ড লেনের গলিতে ঢুকল। প্রিয়নাথের এবার ব্যাগ দুটো বইতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। তার সঙ্গে দুশ্চিন্তা। দীর্ঘ এত বছর পর দেখা সত্যিই সত্যপ্রিয়ই তো! না অন্য কেউ! এমনিতেও ভয় মিশ্রিত চেহারা। কোলকাতা শহর - কে কোন মতলবে থাকে কে জানে। আবার ব্যবসাও করে লোক ঠকানোর। পরখ করার জন্যই বলল – সত্য তোর ছিয়াশির বন্যার কথা মনে আছে?

– বাঃ মনে নেই আবার। সারাজীবন সে স্মৃতি ভোলার নয়। সাঁতার জানি না। ভাসমান একটা কাঠের গুঁড়িকে দেখতে পেয়ে আঁকড়ে ধরেছি। হঠাৎ দেখি গুঁড়ির অন্য প্রান্তে একটা সাপ জড়িয়ে আছে। ভয়েই গুঁড়ি ছেড়ে দিলাম। আমি তখন ডুবছি-উঠছি। ঠিক সেই সময় তোর আবির্ভাব। তুই জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচিয়েছিলি।

না, আর কোন সন্দেহ নেই। এ সত্যপ্রিয় ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

ব্যস্ত গলি দিয়েও দ্রুত হাঁটছে সত্যপ্রিয়। তার চেনা পথে। প্রিয়নাথ পাল্লা দিতে পারছে না। গ্যাপ তৈরি হচ্ছে। দু'চোখ সজাগ রেখে শুধু অনুসরণ করছে। কোলকাতার অলি-গলি। সত্যপ্রিয় মাঝে মাঝে পিছনে তাকাচ্ছে।

যেখনে থামল নিচটা বেশ অন্ধকার। সিঁড়িতে ওঠার মুখে সত্যপ্রিয় একটা ব্যাগ হাতে নিল। আলো আঁধারি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। দোতলার সিঁড়ির ধাপে ব্যাগটা রেখে দরজার তালা খুলল।

– আয়, ভেতরে আয়।

জানলার একটা পাল্লা খোলা ছিল। বাইরে থেকে গরম হাওয়া এলেও ভেতরটা বেশ ঠান্ডা। মনে হয় ছাদের ওপর আরও ঘর আছে। পর্দাটা টেনে দিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিল সত্যপ্রিয়। টেবিলের উপর একটা ফটোফ্রেম। সত্যপ্রিয়র পাশে এক যুবতীর ছবি। বেশ সুশ্রী। সত্যপ্রিয়র ছোট ছোট চুল কাটা, চকচকে দাড়ি কামানো, পরিচিত চেহারা। তারমানে সত্যপ্রিয় বিবাহিত। কিন্তু ওতো সন্ন্যাসী হবার বাসনা নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল।

প্রিয়নাথ আড়ষ্ট ভাবে বলল – তুই তো সাধু হবি বলে বাড়ি ছেড়েছিলি। শুনেছিলুম ব্রহ্মচারীও নাকি হয়েছিস।

টেবিলের উপর রাখা জলের বোতলটা হাতে নিয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে কিছুটা জল খেয়ে বোতলটা প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে দিল।

– ঠিকই ধরেছিস। ওই ফটোতে যাকে দেখছিস সে আমার স্ত্রী। ফ্যানের নিচে চেয়ার টেনে নিয়ে পাশাপাশি বসল।

– ঘর ছাড়ি সাতানব্বই-এ সন্ন্যাসী হবার বাসনা নিয়ে। কারণটা নিশ্চই জানতিস।

উচ্চমাধ্যমিকে বিপর্যয়ের পর আর একটা বিপর্যয় ঘটেছিল। প্রেম বিপর্যয়। অনুমান করেই বলল – বাসন্তী।

– ঠিকই ধরেছিস। আর জানারই তো কথা। তুই আমার সবেচেয়ে কাছের বন্ধু। ওর জন্যই আমার পড়াশোনাটা শেষ হয়ে গেল। ছেড়ে দে - কী যেন বলছিলুম। শোন প্রেমে মোটে লাথ খেয়ে কী সন্ন্যাসী হওয়া যায়। প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে আরও অনেক কিছু লাগে। মঠের নিয়ম বেশ কড়াকড়ি। বেশ কয়েক বছর ব্রহ্মচারী দশা কাটানোর পর পরীক্ষায় সফল হলে গেরুয়া বসন পরিধান করে তবে সন্ন্যাসী হয়। যে ছেলের প্রায় সবেতেই বিপর্যয় ঘটে সে কি করে এক চান্সে ব্রহ্মচর্য পরীক্ষায় পাশ করবে! আর এ পরীক্ষায় চান্স একবারই। প্রথম

শর্তেই প্রায় আটকে গিয়েছিলুম। লেখাপড়া তো বেশিদূর হল না। মিশন আবার এ ব্যাপারে একটু খুঁতখুঁতে। তবুও স্থান হয়ে গেল। শুরু হল ব্রহ্মচর্য। প্রথম প্রথম ঠিকই চলছিল। তারপরই সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার ভেতর যে আমিটা আছে তাকে লুকিয়ে রাখব কী করে? কোন মহিলার দিকে তাকালেই দৃষ্টি সরাসরি বুকের দিকে চলে যাচ্ছিল। চেষ্টা করেও স্বভাবের পরিবর্তন আনতে পারছিলাম না। কতদিন আর চাপা থাকে। একদিন চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটল। নিচফল - বিতাড়িত। তখন ঘরে ফেরারও রাস্তা বন্ধ। মোবাইল তো ছিল না - একেবারে যোগসূত্রহীন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষে এই ব্যবসা আমাকে পথ দেখাল। আমার সাধু সাজাও হল আবার প্রত্যাশিত রোজগারও হতে লাগল।

– সত্যিই ভালো রোজগার রয়?

– হয় কীরে? এই ফ্লাটটা দেখে বুঝতে পারছিস না। যদিও এখন ভাড়া থাকি। তবে কেনার মতো সঙ্গতি আছে। ইদানিং একটু মন্দা চলছে। স্যোসাল মিডিয়া ব্যবসার ক্ষতি করছে। তাই গঙ্গার ধারে এক কালীমন্দিরে রোজ সন্ধ্যাবেলা বসি। ওখানে রোজগার বেশ ভাল। প্রিয়নাথ যত শুনছে অবাক হচ্ছে। এত পরিবর্তন! বিস্ময়ের পাশাপাশি জন্ম নিচ্ছে ঘৃণা। ক্ষোভের সঙ্গেই বলল – ভয় নেই। যতদিন অশিক্ষা থাকবে, কুসংস্কার থাকবে, মানুষের মনে মৃত্যুভয় থাকবে ততদিন এই ব্যবসায় মার নেই।

সত্যপ্রিয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

– চানটা করে নিই, বেশ খিদে পেয়েছে। তুইও চান করবি তো?

– না রে, আমি ভোরবেলা করেছি। বাইরে হোটেলে খাবি তো?

– সে সব তোকে ভাবতে হবে না। ওই ফোটোতে যে মহিলাকে দেখছিস, সকালে রান্না করে দিয়ে গেছে।

– তোর বউ কোথায়?

– ও একটা নার্সিংহোমে কাজ করে। নার্স, সন্ধ্যার আগে ফিরবে না।

সত্যপ্রিয় বাথরুমে স্নান করছে। জলের শব্দ ভেদ করে গুনগুন গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রিয়নাথ বেসিনে ভাল করে মুখটা জলের ঝাপটা দিয়ে ধুলো। চুলে হালকা জল বুলিয়ে নিল। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে আবার চেয়ারে বসল। সত্যর এই পরিণতি দেখে বুকের মধ্যে এক ধরণের কষ্ট অনুভব হচ্ছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সন্ন্যাসী হতে না পারাটা কষ্ট দিচ্ছে না। কষ্ট দিচ্ছে ওর এই পেশাটা।

এক সময় ওরা দুজনেই বিজ্ঞান মঞ্চে নাম লিখিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় কোন অনুষ্ঠান হলেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বোঝাতো কোনটা বিজ্ঞান, কোনটা কুসংস্কার। গ্রামে কোন লাইব্রেরি ছিল না। কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে গ্রামে চাই লাইব্রেরি। সঙ্গী - সাথীর অভাব ছিল না। সত্যই ছিল মধ্যমণি। সেই সত্যপ্রিয় কিনা এই লোক ঠকানোর ব্যবসায়! যার বিরুদ্ধে আন্দোলন তাকে আশ্রয় করেই ...।

বেশ মনে আছে, সত্যপ্রিয়র বাড়ির পেছনেই ছিল নিমাই মোহন্তর বাড়ি। কীর্তনের দলে খোল বাজাতো। সারা বছর কাজ থাকত না। নিমাই মোহন্ত তখন ভবিষ্যৎ বাণীর ব্যবসা শুরু করেছে। সঙ্গে ছেলে হওয়ার মাদুলি। সত্যই খবরটা দিয়েছিল। পদ্ধতি অভিনব। সাদা কাগজে আগের দিন রাতে মোম দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী লিখে রাখা হতো। ইনফরমার থাকত। সেই কাগজের ওপর সিঁদুর ছড়িয়ে হাত দিয়ে বারে বারে ঘনলেই মোম দিয়ে লেখা বিভিলিপি স্পষ্ট হয়ে উঠত। কারসাজিটা ধরা পড়ে যেতেই নিমাই মোহন্তর সেকি আকুতি। কিন্তু আমরা তখন বিজ্ঞান মঞ্চের সক্রিয় সদস্য। বেশ লোক ঠকিয়ে রোজগার হচ্ছিল - সেটা বন্ধ হয়ে গেল। শেষে বাধ্য হয়ে সাইকেল নিয়ে হাটে সবজি বিক্রি করতে লাগল। এ কাজে পরিশ্রম হলেও দিনতো চলে যাচ্ছিল। সেই সত্যপ্রিয়র এত অধঃপতন।

খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সত্যপ্রিয়। স্নানের পর খালি গায়ে বেশ পবিত্র দেখাচ্ছে। শুধু চুল, দাড়িটা বেমানান লাগছে। ও দুটো স্বাভাবিক হলেই ...।

ছোট্ট টেবিল। তার ওপরেই খাবার সাজিয়ে নিল। প্রিয়নাথের কেমন সংকোচ হচ্ছে। বহুদিন পর হঠাৎ দেখা - তারপরই খাবার টেবিলে।

– কী ভাবছিস? কেয়া খেয়ে গেছে। ও একটু বেশি বেশিই রান্না করে। নো সংকোচ।

– না, না, সংকোচ করব কেন? তুই তো জানিস খিদের সময় আমার কোন সংকোচ ও সংস্কার থাকে না।

খেতে খেতে আচমকাই কথাটা ছুঁড়ে দিল – তোদের কোন ছেলে মেয়ে নেই?

– নারে, হয়নি। অনেক চেষ্টা করেছি। কেয়াতো নার্সিংহোমে কাজ করে, অনেক ডাক্তারের সঙ্গে চেনা-জানা। তবুও ...।

সুযোগটা এসেই গেল। একটু ঠেস দিয়ে বলল – কেন, তোর জরিবুটি, মাদুলি। অব্যর্থ ওষুধ, এতেও কাজ হয়নি?

– খেয়্যা করছিস? কর - সুযোগ যখন পেয়েছিস। এটা ব্যবসা। –যাক, তাহলে স্বীকার করছিস এটা ব্যবসা। কিন্তু তাহলেও কোন সততা থাকবে না?

– তুই তো ব্যবসা করিস, ঠকাস না?

– জ্ঞানত না। আমার তো না ঠকানোটাই মূলধন। কিন্তু তুই যেটা করছিস এটা ব্যবসাও নয়। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে লোক ঠকানো।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবই রইল সত্যপ্রিয়। মনের মধ্য ঘূরপাক খাচ্ছে নানা ভাবনা।

– আমি পরিস্থিতির স্বীকার।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল – হ্যাঁরে বাড়ির সকলে ভালো আছে তো?

প্রিয়নাথ যেন ঠিক এই কথাটা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

– বয়স বেশি হলে অসহায় মানুষ যেমন থাকে। তার ওপর তোর বাবাতো এ্যাকিউট সি ও পি ডি পেসেন্ট। এই মুহূর্তে তোদের বাড়িতে একজন নার্সিং জানা লোকের প্রয়োজন। তার জায়গায় অসহায় বুড়ো-বুড়ি ...।

– কেন দাদা-বৌদি? দাদাতো গ্রামের ইস্কুলেই পড়ায়।

– তাতে কী? সে তো ওই বাড়িতে থাকে না। পাশেই আলাদা বাড়ি করে দিব্যি আছে। মাঝে মাঝে তোদের বাড়ি যায় শুনেছি। তবে বাবা-মার খোঁজ নিতে নয় - সম্পত্তিটা যাতে নিজের নামে হয় সেই ধান্দায়। তুই তো সাধু হয়ে গেছিস।

সত্যপ্রিয়র নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে।

– একটা সত্যি কথা বলবি?

– এ রকম করে বলছিস কেন?

– তুই বিয়ে করে এখানে রয়ে গেলি কেন? দিব্যি তো নির্ভয়পুরে থাকতে পারতিস। তোদের জমি-জায়গাও তো খুব কম ছিল না।

খেতে খেতে সত্যর হাত থেমে গেল। কী বেন ভাবছে।

– বিয়ের পর কোন্ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না বল। কেয়া আমাকে কতবার যে বলেছে। এখন আর বলে না। হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

ভেজা ভেজা কথাগুলো যেন ছুঁয়ে গেল। সত্যপ্রিয় ইতস্তত করছে, কিন্তু কারণটা বলতে পারছে না। অস্বস্তি হচ্ছে। প্রিয়নাথ তো ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু, যাকে নিঃসংকোচে সবকিছু বলা যায়। এতদিনের জমে থাকা কষ্ট, ব্যথা বলতে হয়তো নিজেকে হালকা মনে হবে।

– কেয়াকে আমি প্রথম আবিষ্কার করি হারকাটা গলিতে। মৃদ্যু আলোয় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে ছিল। উচ্ছ্বল নয়, নিষ্প্রভ মুখ। দেখেই মনে হয়েছিল এ লাইনে নতুন। পুরুষকে কাজে লাগানোর কোন বিদ্যেই রপ্ত করতে পারে নি। সারা মুখে ভয় মিশ্রিত করুণ ছায়া। যেন খাঁচায় ভরা পাখি। বেশ্যালয়ে সচরাচর এ ধরণের মেয়ে বেশি দেখা যায় না। জেনেছিলাম দুর্ভাগ্যই ওকে ওখানে এনেছিল। ওর কাহিনি শুনে আমি কেমন হয়ে গেলাম। জেদের বসেই বিয়ে করে ফেললুম। সেখানেও কম ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। হারকাটা গলিতে ঢোকা যত সহজ, বেরুনো ততোধিক কঠিন।

পরিবেশটা বদলে গেল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সিলিং ফ্যানের শব্দটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

– এবার বল কোন মেয়ের পক্ষে কী গণিকালয় থেকে সোজা শ্বশুরালয়ে যাওয়া যায়?

খাওয়া প্রায় শেষ। প্রিয়নাথ সত্যপ্রিয়র দিকে গভীর ভাবে তাকালো, না, এখনো সম্পূর্ণ অধঃপতনে যায়নি তাহলে।

– কীরে কী ভাবছিস? নিশ্চয়ই আমাকে নরকের কীট ভাবছিস? যে কিনা বেশ্যালয়েও যায়। তখন তো আমার জীবনটাই অস্থির। একেবারে ঘেঁটে যাওয়া জীবন। কেয়া সত্যিই ভীষণ ভালো মেয়ে। আমি অনেক বদলে গেছি।

প্রিয়নাথ এতক্ষণ ছিল শ্রোতা।

– তোর বাবা-মা জানে তুই কোন মিশনে বা আশ্রমে সাধু হয়ে গেছিস। বাবা-মা তো, তাদের অন্তর বলে তুই একদিন না একদিন ফিরে যাবি। এখনও তোর পথ চেয়ে থাকে। তোদের বাড়ি মাঝে মাঝেই তো - ঠিক বুঝতে পারি। তোরা গেলে ওনারা খুব খুশিই হবেন। তাছাড়া আমি তো আছি।

– না রে, যত সহজে বলছিস তত সহজ নয়। আমাদের সমাজটা এখনও অতটা বদলায়নি।

– সে তো তোকে দেখেই বুঝতে পারছি।

কথাটা সত্যপ্রিয়র বিবেককে যেন খোঁচা দিল। কোন রি-অ্যাক্ট করল না। বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং-এর পাশেই সিঙ্গল খাটটা দেখিয়ে বলল – একটু গড়িয়ে নে। জামার পকেট থেকে সিগারেটে প্যাকেটটা বের করে বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিল।

– না রে খাব না।

– তুই তো আগে খেতিস?

– বেশ কয়েক বছর ছেড়ে দিয়েছি। অনেকটা খরচও বেঁচে গেছে।

– দেখছি, তুই তো সাধু পুরুষ হয়ে গেছিস। বিয়ে টিয়ে করেছিস তো? নাকি সংসারে এক সন্ন্যাসী।

– সামনের বছর মেয়ে মাধ্যমিক দেবে। পড়াশোনায় বেশ ভালো।

– বাঃ বেশ সুখেই আছিস। এত অল্প রোজগারে সুখে থাকার রহস্যটা কী?

– সে তো তুই বলবি। এসব কথার উত্তর সাধুদের কাছেই তো পাওয়া যায়। ভোগ সর্বস্ব না হয়ে ত্যাগী হও।

বিবেকের খোঁচাটা ইচ্ছে করেই আবার দিল প্রিয়ব্রতর। ভাবল যদি বন্ধুর অন্তরে কিছুটা হলেও ক্ষরণ হয়। উদয় হয় শুভ বুদ্ধির।

– আসলে কী জানিস, সুখে-অসুখে থাকাটা তো নিজের হাতে। প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদাগুলো একটু ছোট করে নিতে পারলেই সুখে থাকা যায়। এটা একটা আর্ট। যুক্তিতে সত্যপ্রিয় যেন বারে বারেই হেরে যাচ্ছে। প্রশ্নাকারে দেখা দিচ্ছে সাধু কে?

– নারে, এবার উঠব। চারটে চল্লিশের ট্রেনটা ধরতেই হবে।

– বোস না, একান্তই যদি থাকতে না চাস, কেয়া ফিরলে যাবি। ট্রেন তো রাত ন'টা পর্যন্ত আছে।

দীর্ঘদিন বাড়ি না গেলেও ট্রেনের সময়গুলো নিখুঁত মনে রেখেছে সত্যপ্রিয়।

– নারে, কেয়ার সঙ্গে পরে নিশ্চয়ই দেখা হবে। তোর আস্তানাটা তো দেখে গেলাম। আমাকে তো প্রতি মাসেই দু-একবার বড় বাজারে আসতে হয়। তুই কী এখন বেরুবি?

– আরেকটু পরে বেরোব।

মোবাইল নম্বরটা সেভ করে প্রিয়নাথ একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে আরেকটা তুলতে যেতেই সত্যপ্রিয় তুলে নিল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ভারাক্রান্ত মন, কিছুতেই বন্ধুকে বুঝতে দিল না।

প্রিয়নাথ সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল

– বলছিলিস না, কেয়াকে বিয়ে করে এমনই গর্হিত কাজ করেছিস যার কারণে তুই শিকড়ের টানটাকেও অস্বীকার করছিস। শোন, কেয়াকে বিয়ে করে তুই অত্যন্ত এক মানবিক, সামাজিক কাজ করেছিস। বরং তুই যে ভাবে অর্থউপার্জন করছিস সেটাই গর্হিত কাজ। পারলে এটা ছেড়ে দে। আর কেয়াকে নিয়ে যে গোপন কাহিনি আমাকে শোনালি তা গোপনই থাকবে। গোপনীয়তা কখনও কখনও পবিত্র হয়। আর যদি জানাজানি হয়ও আবার আগের মতো একসঙ্গে লড়াই করব।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে প্রিয়নাথ। এবার হারিয়ে যাবে। হঠাৎ অস্ফুটে বলে উঠল – প্রিয় ...।

থমকে দাঁড়াল। – কিছু বলবি?

সত্যপ্রিয় নিরুত্তর।

– তোর বাবা-মাকে বলব তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

এবারও কোন উত্তর দিল না।

প্রিয়নাথ চলে গেছে। কতক্ষণ যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল নেই। দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল সত্যপ্রিয় মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠছে তার ছেলেবেলা, বাবা-মা, এমনকি কাছের বন্ধু প্রিয়নাথের সঙ্গে মধুর দিন যাপনের ছবি। প্রিয়নাথের হঠাৎ আবির্ভাব সব এলোমেলো করে দিচ্ছে। কেয়াও তো তার এভাবে রোজগার মেনে নিতে পারে নি।

বেশিক্ষণ শুয়েও থাকতে পারল না। অস্থিরতা তাকে ঘিরে রেখেছে। বাথরুমে চোখে-মুখে জল দিয়ে ঘড়িটা দেখল। আবার গেরুয়া বসন পরিধান করে কাঁধে ঝোলা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে পড়ল। হাওড়া ব্রিজে তার সেই নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়াল। ঝোলা থেকে চাদরটা বের করে মেলতে গিয়েও মেলল না। যেখানে সে অবলীলাক্রমে বসে পড়ত, সেখানে যেন বসতেও বাধা। মনের মধ্যে সুপ্ত সব গুনগুলো যেন জাগ্রত হচ্ছে। কিছুতেই বসতে পারছে না। দাঁড়িয়ে থাকাটাও বিসদৃশ্য। উদ্‌ভ্রান্তের মতো জনস্রোতে মিশে গিয়ে ব্রিজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে হাঁটতে লাগল। দু'পাক হাঁটার পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

সূর্য এখন প্রায় হেলে গেছে। বাতাসটা বেশ জোরে জোরেই বইছে। গঙ্গার জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। হাঁটতে হাঁটতে স্ট্যান্ড রোড আর ব্রাবোর্ন রোডের শেষে ব্রিজটা যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে এসে দাঁড়াল। সূর্য প্রায় অস্তাচলে। তার শেষ আভাটুকু গঙ্গার জলে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। চুপি চুপি নিচে নামতে লাগল। পাশেই একটা আখড়া। খালি গায়ে বারবেল নিয়ে শরীর চর্চা করছে কিছু মানুষ। একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল। আরও কিছুটা নেমে একেবারে গঙ্গার কিনারে জলের কাছাকাছি দাঁড়াল। গঙ্গার জলে স্রোত থাকলেও মন তার পুকুরের জলের মতোই স্থির। ভেসে উঠছে বাবা-মার মুখ। আর সেই অমোঘ বাণী - ছেলেকে চেনা যায় বার্ধক্যে।

এরপর ১৯ পাতায়...